

নূর কুতবুল আলম (২)

ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম
ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন

নূর কুতবুল আলম (র)

২০১১ খ্রিঃ

ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম
ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুলভ সংস্করণ- ১০

নূর কুতবুল আলম (র)

ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম

ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০

ইফাবা প্রকাশনা : ২২১১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭

ISBN : 984-06-0874-6

প্রথম প্রকাশ

মে ২০০৪

জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

রবিউস সানী ১৪২৫

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

বর্ণবিন্যাস

নবনী কম্পিউটার

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ

গিয়াসউদ্দীন খসরু

মুদ্রণ ও বাঁধাই

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

মূল্য : ১২.০০ (বারো) টাকা

NUR KUTBUL ALAM (R) [The Life-sketch of Nur Kutbul Alam] : Written by Dr. A.K.M. Nurul Alam and Dr. Muhammad Afaj Uddin and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 May 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk : 12.00; US Dollar : 00.50

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন যখন যেভাবেই হোক না কেন, এ বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন যে, এ দেশবাসী কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ, এ দেশে ইসলামের প্রচার প্রসার ও ব্যাপ্তি লাভের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরো অনেক পরে। শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা এ দেশের অনৈসলামী সংস্কৃতির মুকাবিলায় ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠার ব্যাপারটি ছিল আসলেই দুরূহ এবং সংগত কারণেই ধীরগতি সম্পন্ন সময় সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। রাতারাতি কোন প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির বিলোপ সাধন যেমন অসাধ্য, তেমনি নতুন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাও অতি তাড়াতাড়ি সম্ভবপর নয়। এর জন্য প্রয়োজন নতুন সংস্কৃতির সৌন্দর্য, সৌকর্য, আদর্শিক কল্যাণময়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, প্রচলন ও বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা, যার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিশ্বস্ততা, সুপরিচালিত পদ্ধতি এবং সুদীর্ঘ সময়কাল। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে এ সত্যটি আক্ষরিক অর্থেই প্রতিভাত হতে দেখা গেছে।

ইসলামের সুমহান বাণী তওহীদের মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় সংস্কৃতি, বঙ্গদেশে তার লালন, বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে ওলী-দরবেশ, সূফী, মুহাদ্দিস, মুআল্লিম, মুবাল্লিগ, দাঈ, আলীম, ফকীহ আবিদ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও পার্থিব সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে আজীবন একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন। এ মহতী উদ্দেশ্য সাধনে এঁদের অনেকে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। মহৎপ্রাণ এসব ওলী-দরবেশের মধ্যে অনেকে আরব, পারস্য, তুর্কিস্তান প্রভৃতি স্থান থেকে আগত, আবার কেউ কেউ এ দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মহতী কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। হযরত নূর কুত্বুল আলম এমনি একজন সূফীকুল শিরোমণি স্বনামধন্য দরবেশ। তাঁর প্রকৃত নাম নূরুদ্দীন নূরুল হক হলেও তিনি মূলত নূর কুত্বুল আলম নামেই বিশেষভাবে পরিচিত।^১ এ মহান সূফী বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এ দেশের মাটিতেই সমাহিত হয়ে আছেন। এ নিবন্ধে আমরা তাঁর জীবন ও কর্মের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তবে তাঁর যুগে ও আনুষঙ্গিক সূত্রের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, সম্ভবত ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে তিনি তদানীন্তন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আইন-ই-আকবরী (দ্র. খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭১) গ্রন্থে তাঁর জন্মস্থান লাহোর বলে উল্লেখ করা হলেও এ দাবীর সপক্ষে কোন জোরালো যুক্তি নেই। বরং অনুসন্ধান জানা গেছে যে, নূর কুতুবুল আলমের জন্মের পূর্বে বা পরে তাঁর পিতা বাংলার বাইরে কোথাও অবস্থান করেননি সুতরাং পাণ্ডুয়াস্থ পিতৃগৃহেই তাঁর জন্ম।^২ তাঁর মার নাম হাফিয বিবি যামান।

উল্লেখ্য, নূর কুতুবুল আলমের পিতা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী শায়খ হয়রত আলাউল হক। আলাউল হকের পিতার নাম উমর বিন আসআদ লাহোরী (খালিদী)। নূর কুতুবুল আলমের দাদা অর্থাৎ উমর বিন আসআদ সুলতান সিকান্দার শাহের সময়ে (১৩৫৮—১৩৮৯ খৃ.) খাজাঞ্চীখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২—৫৭)-এর পূর্বপুরুষগণ যে সময়ে আরব থেকে বাংলায় আগমন করেন, ঐ সময়ে কুতুবুল আলমের দাদাও ভাগ্যান্বেষণে প্রথমে লাহোর, দিল্লী ও পরে পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন।^৩ অল্প দিনের মধ্যে তিনি দিল্লীর ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের কাতারে উন্নীত হন এবং এখানেই তাঁর বিখ্যাত পুত্র শায়খ আলাউদ্দীন, আলাউল হক জন্মগ্রহণ করেন।^৪ তাঁর (কুতুবুল আলমের দাদা) নামের শেষে লাহোরী এবং খালিদী উপাধি থাকার কারণ তিনি আরব থেকে প্রথমে লাহোরে এসেছিলেন; এবং হয়ত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা)-এর বংশধর ছিলেন। আলাউল হকের কবরের চতুষ্পার্শ্বে যে বেষ্টনী রয়েছে, তার দ্বারের উপরস্থ শিলালিপি থেকে জানা যায়, তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ বিন উমর বিন আসআদ খালিদী;^৫ যদিও তিনি আলাউদ্দীন বা আহমদ নামে নয়, বরং আলাউল হক নামেই সুপরিচিত। আলাউল হক এবং তাঁর পিতা উভয়ই আরবের কুরাইশ (হাশিমী) বংশীয় এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তাঁদের গোত্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ বলে দাবী প্রতিষ্ঠা করেছেন।^৬ সুতরাং নূর কুতুবুল আলম বংশ মর্যাদায়, দীনদারী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

পিতৃ পরিচয়

আলাউল হক তাঁর সুযোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ও একজন সুপণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অপর দিকে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষে পৌঁছার পূর্বেও তৎকালীন সমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি

হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। সম্ভবত ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে তিনি ‘গনজে নাবাত’ (সম্পদের ভাণ্ডার)^৭ অথবা ‘গনজে নওবাত’ (শোধিত চিনির ভাণ্ডার)^৮ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তা ছাড়া উচ্চ কুল মর্যাদার ব্যাপারেও তাঁর কিঞ্চিৎ গর্ব ছিল। কালক্রমে এ সংবাদ দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী সুলতানুল মালায়েক খাযা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬—১৩২৫) দরবারে পৌঁছে যায়। তিনি এতে অসন্তুষ্ট হন। কারণ নিযামুদ্দীন আউলিয়া মনে করেছিলেন যে, আলাউল হক এহেন উপাধি ধারণ করে সম্ভবত তাঁর (নিযাম উদ্দীন) প্রিয় মুর্শিদ (১১৭৭—১২৬৯)-এর সমতুল্য ভেবেছেন। কারণ শায়খ ফরীদ উদ্দীন নিজে ‘শকরগঞ্জ’ বা ‘গঞ্জে শকর’ (চিনির ভাণ্ডার) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। নিযাম উদ্দীন আউলিয়া তাই বিরক্ত হন আলাউল হক বোবা হয়ে যান।^৯ অন্যদিকে নিযাম উদ্দীন আউলিয়ার অন্যতম প্রধান খলীফা শায়খ আখি সিরাজ উদ্দীন উসমান (মৃত ৭৫৮ হি./১৩৫৭ খৃ.) তাঁর মুর্শিদের নির্দেশক্রমে বাংলায় আগমন করেন এবং গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।^{১০} অল্পকালের মধ্যেই গৌড়ের সুলতান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাঁর মুরীদী গ্রহণ করেন। এ সময় আখি সিরাজুদ্দীনের অসাধারণ অধ্যাত্ম শক্তির আকর্ষণে শায়খ আলাউল হক তাঁর মুরীদী গ্রহণ করেন এবং তাঁর দোয়ায় পুনরায় বাকশক্তি ফিরে পান। অতঃপর আলাউল হক বিভূ-সম্পদ ও আভিজাত্যের গৌরব পরিহার করে দারিদ্র ও ত্যাগের জীবন গ্রহণ করে নেন। তাঁর অন্তরে গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র যেন বিদ্যমান না থাকে মুর্শিদ আখি সিরাজ সে ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কথিত আছে, শায়খ আখি সিরাজ ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করতেন। তাঁর মুরীদ আলাউল হক মুর্শিদ চাওয়া মাত্রই যেন গরম খাবার পরিবেশন করতে পারেন এ জন্য মাথায় একটি গরম পাত্র বহন করে মুর্শিদের অনুসরণ করতেন। এর ফলে আলাউল হকের মাথার চুল পুড়ে টাক পুড়ে গিয়েছিল। আলাউল হকের কিছু আত্মীয়-স্বজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। আখি সিরাজ আলাউল হককে নম্রতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ অবস্থায় (গরম পাত্র মাথায়) সে সব উচ্চপদস্থ আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে যেতেন।^{১১} অবশ্য কোন কোন সূত্র মতে আলাউল হকের মাথায় গরম পাত্র বহন করার ঘটনাটি আখি সিরাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং আলাউলের অধ্যাত্ম জগতের অন্যতম পীর মখদুম শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী (মৃ. ৬২৩ হি./১২২৬ খৃ. মতান্তরে ৬৪২/১২৪৪)-এর সাথে সম্পৃক্ত।^{১২}

এভাবে আলাউল হক সুদীর্ঘ সাধনা, ক্রেশ ও কৃচ্ছতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হন। আখি সিরাজ মুরীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে খিলাফত প্রদান করেন। বলাবাহুল্য, আখি সিরাজের মুরীদগণের মধ্যে

আলাউল হকই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের পূর্বেই তিনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।^{১৩} আলাউল হক তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সর্বোচ্চ পন্থায় ব্যয় করার নিমিত্ত গৌড়ে একটি 'খানকাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনি পরিব্রাজক ও বিদ্যার্থীগণের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর বদান্যতায় গরীব দুঃখী মানুষ যেমন নিজেদের অভাব মোচনের সুযোগ পেত, তেমনি শিক্ষার্থীগণ শিক্ষার আলো লাভ করতো। তাঁর বদান্যতার সামনে গৌড়ের সুলতানের (সম্ভবত প্রথম সিকান্দার শাহ (১৩৫৮—১৩৮৯ খৃ.) বদান্যতা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সুলতান ঈর্ষান্বিত ও শংকিত হয়ে আলাউলকে বাংলার অপর রাজধানী সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন।^{১৪} সেখানে তিনি দু'বছর নির্বাসিত জীবন যাপনকালেই গৌড়ের মতই একটি খানকাহ নির্মাণ করেন এবং বিপুল উৎসাহে গরীব-দুখীদের ভরণ-পোষণের জন্য অকাতরে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। এ বিরাট অংকের টাকা কোথা থেকে আসতো তা কেউ বলতে পারতো না। কারণ তাঁর সম্পত্তি বলতে ছিল দু'টি বাগান, যা তিনি পরবর্তীকালে একজন ভিক্ষুককে দান করে দিয়েছিলেন।^{১৫} তিনি প্রায়ই বলতেন, লংগরখানার পেছনে তিনি যা খরচ করেন, তা তার মরহুম মুর্শিদ আখি সিরাজের খরচের এক দশমাংশও নয়।^{১৬}

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটতো। ১৩৯৮ সালের ২০শে মার্চ (১লা রজব, ৮০০ হি.) ভারত বিখ্যাত এ সূফী পাণ্ডুয়ায় পরলোকগমন করেন এবং সেখানকার ছোট দরগাহ নামে পরিচিত সমাধি ভবনে তাঁকে দাফন করা হয়।^{১৭}

উল্লেখ্য, আলাউল হকের অধ্যাত্ম সাধনা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুর্শিদ আখি সিরাজ তাঁকে শুধু খিলাফতই দান করেননি, বরং তাঁর সাথে কন্যার বিয়ে দিয়ে তাঁকে জামাতারূপেও বরণ করে নিয়েছিলেন।^{১৮} সুতরাং আখি সিরাজ নূর কুত্বুল আলমের দাদা পীর এবং নানা। নূর কুত্বুল আলম-এর একমাত্র অগ্রজ আযম খান আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সুলতানের পরিষদে মন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর একমাত্র বোনের বিয়ে সম্পন্ন হয় জনৈক মওলানা তাজউদ্দীনের সাথে।^{১৯}

শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ

নূর কুত্বুল আলম তাঁর পিতার মতই অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। পিতার তত্ত্বাবধানে শৈশবেই তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করেন। কথিত আছে, নূর কুত্বুল আলম তদানিন্তন গৌড়ের শাসনকর্তা সুলতান সিকান্দার শাহ-এর পুত্র

গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (১৩৯২—১৪১০ খৃ.)-এর সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বর্তমান বীরভূম জেলার নাগোরের বিখ্যাত সাধক ও শিক্ষাবিদ শায়খ হামীদ উদ্দীন কুন্‌জনশীন (১২৫২—১৩৬০ খৃ.)-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর নিকট কুত্বুল আলম যাহিরী ইল্ম তথা পার্শ্ব ও ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর পিতার তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনাবাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পালা শুরু হয়।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে আলাউল হক পুত্রের শারীরিক ও মানসিক কঠোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণতা সাধন, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার বিধানসহ এ পর্যায়ে তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পিতার খান্‌কায় এবং লংগরখানায় আগত ভিখারী ফকীর, মুসাফির, ছাত্র ও অভ্যাগতদের সার্বিক সেবায়ত্নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাঁর উপর। তিনি কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে মেহমানের ব্যবহারের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে তাঁদের ওয়ূ-গোসলের জন্য পানি গরম করা, খান্‌কাহ পরিষ্কার করা ও আনুষঙ্গিক দায়িত্বও পালন করেন।^{২০} পিতার নির্দেশে কুত্বুল আলমকে আরো একটি কাজ করতে হতো, তা হলো বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের কূয়া থেকে পানি উঠানো এবং তাদের পানির পাত্র বহনে সাহায্য করা। চার বছর পর্যন্ত তিনি এ খেদমত আনজাম দেন।^{২১} তা ছাড়া সওয়াব রেসানী উপলক্ষে সমাগত মেহমানদের জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হতো। উপরন্তু লংগরের পাকশালার জন্য আট বছর যাবৎ দূরের বন-জংগল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতেন এবং নিজে বহন করে নিয়ে আসতেন।^{২২} এসব কাজকর্মের মাধ্যমে আলাউল হক পুত্রের অন্তর থেকে পার্শ্ব সুখ, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের মোহ বিমোচনের পাশাপাশি খেদমতে খাল্ক-এর বাস্তব সম্মত শিক্ষা প্রদান করেছেন। এ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কুত্বুল আলম যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেবাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কাজের ধরন বা উঁচু-নিচু শ্রেণী বিন্যাস করা মূঢ়তারই নামান্তর। সর্বোপরি মানব অন্তরে অহংবোধ আত্মগরিমা বা অহমিকার বীজ সমূলে ধ্বংস করাও ছিল এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। কেননা, অধ্যাপনাবাদের ভিত রচনায় এটি হচ্ছে, পূর্বশর্ত।^{২৩} কুত্বুল আলম পিতা কর্তৃক নির্ধারিত এ প্রশিক্ষণ কোর্স অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সমাপ্ত করে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করেন। কথিত আছে, একদা কুত্বুল আলম লংগরখানার জন্য জ্বালানি কাঠের বোঝা মাথায় বহন করে ফিরছিলেন। পথে তাঁর অগ্রজ আযম খানের সাথে দেখা হয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, আযম খান ছিলেন সুলতানের একক প্রভাবশালী মন্ত্রী (বা প্রধানমন্ত্রী)। অনুজের ক্লেশময় দিনমজুরের কাজ দৃষ্টে

প্রতিবাদের স্বরে বলেন, ধর্মীয় জগতের একজন বাদশাহ্ কর্তৃক পার্থিব জগতের একজন বাদশাহের প্রতি এতটা সম্মান প্রদর্শনের কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে? উত্তরে নূর কুত্বুল আলম একখানা হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে সুলতানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।^{২৬}

নূর কুত্বুল আলম তাঁর অগণিত মুরীদ ও ছাত্রগণকেও সরকার তথা প্রশাসনকে সর্বাঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করার উপদেশ দিতেন। বস্তুত এটি ছিল তাঁর সামগ্রিক দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনারই অন্যতম কৌশল বা ‘হিকমাহ’। এতে তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কোন প্রশ্ন জড়িত ছিল না। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও এর প্রচার-প্রসার এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার টেকনিক হিসেবেই তিনি সরকারের সাথে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা প্রদানের পথ বেছে নিয়েছিলেন। জানা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ‘খানকাহ’টিকে কুত্বুল আলম মেধা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বলে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও সেবামূলক একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। খানকাহ কেন্দ্রিক তিনি যে শিক্ষালয় (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ছিল তদানিন্তন বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের দিক নির্দেশক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান যাকে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (র)^{২৭} কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁয়ের ইতিহাস বিখ্যাত মাদ্রাসার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।^{২৮} সোনারগাঁয়ের মাদ্রাসার ন্যায় কুত্বুল আলমের মাদ্রাসাও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার ইসলামী জ্ঞান অনুশীলনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। বাংলার বাইরেও এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জ্ঞান পিপাসুগণ ভীড় জমাতে থাকেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, হযরত আবু তাওয়ামাহ ছিলেন মুখ্যত আদর্শ শিক্ষাবিদ ও মুহাদ্দিস এবং নূর কুত্বুল আলমের প্রধান পরিচয় একজন আদর্শ দরবেশ বা পীর হিসেবে। উভয়ের মধ্যে খ্যাতি ও পরিচিতির ভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামী দাওয়াহ পরিচালনায় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে চমৎকার মিল পরিলক্ষিত হয়।

নূর কুত্বুল আলম তাঁর খানকাহ ভিত্তিক ঐসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী সাহায্য পেতেন। জানা যায়, সুলতান হুসেন শাহ ঐসব প্রতিষ্ঠানের নামে প্রচুর লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন।^{২৯} সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক থাকার কারণে একদিকে তিনি যেমন বাংলার বিভিন্ন স্থানে নির্বিঘ্নে ইসলামী দাওয়াতের কাজ আনুজাম দিয়েছেন, অপরদিকে সুলতানও ধর্মীয় কার্যকলাপে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। বস্তুত কুত্বুল আলম

আযম খান ব্যথিত হন এবং তাঁকে এ ধরনের কাজ পরিত্যাগ করে সরকারী দফতরে কোন সম্মানজনক পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি নির্দিধায় এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।^{২৪}

এভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় ক্রমাগত সফলতা অর্জনের মাধ্যমে নূর কুত্বুল আলম সুফীবাদের শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হন। যাহিরী বিদ্যায় তিনি অনেক আগেই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর সময়কালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর (৮০০/১৩৯৮) এবং ‘সাজ্জাদাহ’ বা খিলাফত প্রাপ্তির পর তাঁর জ্ঞান-গরিমা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও মানবিক সেবার কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সাধক এসে তাঁর মুরীদী গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শায়খ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী, সাইয়িদ শামসুদ্দীন তাহির, সাইয়িদ আলী আকবার, শায়খ রুকনুদ্দীন, শায়খ কাকু প্রমুখ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।^{২৫} তাঁর পুত্র রিফাতউদ্দীন, শায়খ আনোয়ার শহীদ এবং পৌত্র শায়খ যাহিদ তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠেন এবং কামালিয়াত হাসিল করেন।

নূর কুত্বুল আলম তাঁর মুরীদদের কেবল আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং সমাজকল্যাণ, মানবতার সেবা ও পার্থিব বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য তুলে ধরার মাধ্যমে তাঁদেরকে তবলীগে দাওয়াতের কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নির্বিকার থেকে কেবল আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা প্রকৃত দাঈর কাজ নয়। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রয়োজনবোধে তাতে সহায়তা করা, রাষ্ট্রনায়কদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করাও একজন সাধকের অন্যতম কর্তব্য। নূর কুত্বুল আলম তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় এ আদর্শই স্থাপন করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে একজন কুশলী ও সফল রাজনীতিবিদ হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। তিনি নিজে সরকারী দফতরে চাকরী গ্রহণ করেননি, এমন কি তাঁর সহপাঠী বাল্যবন্ধু গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (গৌড় সালতানাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর) কর্তৃক দেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণেও সম্মত হননি বটে; কিন্তু তাই বলে তিনি রাজনীতি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন না। রাজন্যবর্গ ও প্রশাসকদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে তাঁদেরকে সুপরামর্শ দিতেন। ইসলামী ধাঁচে প্রশাসন পরিচালনায় তাঁদের উৎসাহিত করতেন। কথিত আছে, একদা সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ নূর কুত্বুল আলমের জন্য এক পাত্র খাবার প্রেরণ করেন যা তিনি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে গ্রহণ করেন। তা দেখে শায়খ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী

প্রশাসনযন্ত্রের বাইরে অবস্থান করেও সূফী দরবেশ, আলিম ও দাঈগণের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় 'প্রেসার গ্রুপ' বা বেসরকারী উপদেষ্টা পরিষদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে কুতুবুল আলমের রাজনৈতিক প্রভাব বলয়কে কোন স্বৈচ্ছাচারিতার সাথে তুলনা করা কোন মতেই সঠিক হবে না। বরং সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ কুতুবুল আলম-এর পরামর্শে ও প্রভাবে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। বংগের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সম্ভবত তাঁর মত এত আকর্ষণীয় চরিত্রের শাসক আর কেউ ছিলেন না। তিনি ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রশাসনের চাপমুক্ত করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।^{৩০}

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

ইলিয়াসশাহী রাজবংশের শাসনামলের শুরু থেকেই অর্থাৎ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪১—১৩৫৮)-এর সময় থেকেই হিন্দুরা সুলতানের অধীন উচ্চ রাজপদে বহাল হয়ে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভাতুরিয়া ৩১ পরগনার জমিদার রাজা কোন্স বা কংস নারায়ণ (যিনি গণেশ নামে সমধিক পরিচিত) ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অতিশয় উচ্চাভিলাষী রাজকর্মচারী। রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বাহ্যত তিনি দক্ষতা, রাজভক্তি ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজ অবস্থান ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, যার ফলে গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের ন্যায় সুলতানের সময়েও তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী আমলা হিসেবেই বিরাজ করছিলেন।^{৩২} 'রিয়াযুস সালাতীন'-এর বর্ণনা মতে, শেষ পর্যন্ত গণেশের চক্রান্তেই আযম শাহ নিহত হন।^{৩৩} গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ-এর মৃত্যুর (১৪০৯) চার বছরের^{৩৪} মধ্যেই রাজা গণেশ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পতন ঘটিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৪১০—১৪১৪) এবং 'দনুজমর্দনদেব' (দৈত্যদলনকারী) উপাধি ধারণ করেন।^{৩৫} তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশী হয়ে উঠেছিল যে, মুসলিম আমীর-ওমরাহগণের পক্ষে তাঁর বিরোধিতা করার মত ক্ষমতা বা সাহস ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃত্ববিহীন বাংলার মুসলমানদের এ পর্যায়ে নূর কুতুবুল আলম রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাল ধরার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি সরাসরি তাদেরকে একত্রিত করে গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেন।

পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচনা করে এবং মুসলমানদের অযথা রক্তপাত এড়ানোর জন্য তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা ইবরাহীম শরকীকে (৮০৪—৮৪৪ হি./১৪০১—১৪৪০ খৃ.) গণেশকে উৎখাত করার জন্য পত্র লিখেন।^{৩৬} ইবরাহীম শরকীকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য তিনি মীর সাইয়িদ আশরাফ জাহাংগীর সিমনানীর কাছেও পত্র লিখেন। সিমনানী ছিলেন শায়খ আলাউল হকের ছাত্র এবং নূর কুতুব-এর আধ্যাত্মিক ভাই বা বন্ধু। ইবরাহীম শরকী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নূর কুতুবুল আলমের পত্র গ্রহণ করেন এবং অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিম কাযী শিহাব উদ্দীন দৌলতাবাদীর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন।^{৩৭} জ্ঞান তাপস সিমনানী এবং দৌলতাবাদী উভয়ই সুলতান শরকীকে অতি দ্রুত নূর কুতুবুল আলমের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহিত প্রদান করেন। ইবরাহীম শরকী বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন এবং বংগ সীমান্তের ফিরোজপুরে (পাণ্ডুয়ায়) শিবির স্থাপন করেন। ভীত সন্ত্রস্ত গণেশ অগত্যা শঠতার মাধ্যমে নূর কুতুবুল আলমের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেন এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। গণেশ দরবেশের কাছে অত্যন্ত বিনয় ও মিনতি সহকারে অনুরোধ জানান তিনি যেন সুলতানকে ফিরে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। গণেশ নূর কুতুবুল আলম-এর দেওয়া শর্তানুসারে মুসলমান হতেও রাজী হন; কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। শেষে তাঁরা (স্বামী-স্ত্রী) পরামর্শ করে বার বছর বয়সের পুত্র যদুকে নিয়ে আসেন এবং তাকে ধর্মাস্তরিত করার জন্য অনুরোধ করেন। নূর কুতুবুল আলম যদুকে ইসলাম ধর্মে বায়আত দান করে তাকে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান। অতঃপর দরবেশ সুলতান ইবরাহীম শরকীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বাংলা আক্রমণ না করে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

দরবেশের অনুরোধে সুলতান সসৈন্যে জৌনপুরে ফিরে যান।^{৩৮} ‘রিয়ায়ুস-সালাতীন’ এর সূত্রে জানা যায় যে, জালাল উদ্দীনের সিংহাসন আরোহণের সংগে সংগে বংগে আবার ইসলামী আইন কানুন জারি হয়।^{৩৯} অবশ্য ইবরাহীম শরকী ফিরে যাওয়ার পর পরই গণেশ আবাবো রাজ্যের কর্তৃত্ব দখল করার পায়তারা করতে থাকেন। ইবরাহীম শরকীর মৃত্যুর পর পুত্র জালালুদ্দীনকে সুবর্ণ ধেনু ব্রতের^{৪০} মাধ্যমে পুনরায় ধর্মাস্তর গ্রহণে বাধ্য করেন। এভাবে পুত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে গণেশ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তা ছিল খুবই সাময়িক ও স্বল্পকালীন (১৪১৭—১৮)। এ সময়ে গণেশের বিশ্বাসঘাতকতায় তা নূর কুতুবুল আলম খুবই মুষড়ে পড়েন এবং আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে মশগুল থাকেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের শক্তি ফিরে আসে। কথিত আছে,

একদিন যখন নূর কুত্বুল আলম আল্লাহর ধ্যানে মশগুল ছিলেন, তখন তাঁর পুত্র শায়খ আনোয়ার অভিযোগ করে তাঁকে বলেন, আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ দরবেশ থাকা সত্ত্বেও গণেশের উৎপীড়ন নিপীড়ন আর কত চলবে? উত্তরে দরবেশ বলেন : 'যেদিন তোমার রক্ত মাটিতে গড়াবে সেদিনই এ অত্যাচার বন্ধ হবে।' অল্প দিনের মধ্যেই দরবেশের এ কথা ফলে যায়। গণেশের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। নূর কুত্বুল আলমের পুত্র শায়খ আনোয়ার এবং পৌত্র শায়খ জাহিদকে তিনি সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন এবং উভয়কে হত্যা করার নির্দেশ দেন। শায়খ জাহিদ আল্লাহর ইচ্ছায় কোনমতে বেঁচে যান। কিন্তু শায়খ আনোয়ারকে সেখানে হত্যা করা হয়। বলা হয়, যেদিন যে মুহূর্তে তাকে সোনারগাঁয়ে হত্যা করা হয় এবং তাঁর রক্ত মাটিতে পতিত হয়, রাজা গণেশও সে দিন সে মুহূর্তেই নিহত হন (১৪১৮)। গণেশের মৃত্যুর পর জালাল উদ্দীন সোনারগাঁয়ের নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে আসেন এবং দরবেশ নূর কুত্বুল আলমের দোয়া নিয়ে পুনরায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।^{৪১} জালাল উদ্দীন মাহমুদ (বা মুহাম্মদ) এবং তাঁর পুত্র শামস উদ্দীন আহমদ শাহ উভয়েই নূর কুত্বুল আলমের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। তারা উভয়েই শায়খের পরামর্শ নিয়ে সুদীর্ঘকাল^{৪২} ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে রাজ্য শাসন করে গেছেন। এ সবই সম্ভবপর হয়েছে নূর কুত্বুল আলমের একনিষ্ঠ সাধনা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বদৌলতেই। অবশ্যই তাঁকে নিজ পুত্রের শাহাদতের ন্যায় সর্বোচ্চ ত্যাগ ও স্বীকার করতে হয়েছে। অথচ, যুগশ্রেষ্ঠ একজন দরবেশ হিসেবে তিনি সামান্যতম আপোসকামিতার আশ্রয় নিলে অতি সহজে নির্বিঘ্নে শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারতেন। তিনি ছিলেন সত্যের পথে আপোসহীন সৈনিক। সত্যিকার মুজাহিদ ও আদর্শ দা'ঈ হিসেবে তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খানকাহু ছেড়ে নির্যাতিত জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মহানবী (সা)-এর আদর্শ বক্ষে ধারণ করে নূর কুত্বুল আলম আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসেবা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছিলেন তাঁর জীবনে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক নূর কুত্বুল আলমের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করে বলেন :

“তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক কলাকৌশলে সেইবার বাংলার মুসলমান যেরূপ আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা বাংলার মুসলিম ইতিহাসে তো নাই-ই—এমন কি, ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসেও অতি বিরল। এ দিক হইতে বিচার করিতে হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, বাংলার বর্তমান মুসলিম সমাজ স্বনামধন্য হযরত কুত্বুল আলম-এর নিকট কেমন অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত! কেবল স্বধর্ম ও স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বীয় অপমানের কথা বিস্মৃত

হইয়াছিলেন; অর্থ ও বিত্ত, পরিচারক ও অনুচরবর্গকে দস্যুবৃত্তিপরায়ণ রাজা গণেশের কোপানল বেদীতলে বিসর্জন দিয়াছিলেন, এমন কি, স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র শায়খ আনোয়ারকে পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”^{৪৩}

ড. এ. কে. আইয়ুব আলী এ মহান ওলীর কৃতিত্ব বর্ণনায় বলেছেন :
“Shaikh Nurudin known as Nur Qutub-Al-Alam of Pandua was a great saint and savant of dynamic personality of Bengal, who served Bengal from going under Hindu rule and from bloodshed by converting Jadu,— son of king Ganesh, who captured the throne of Bengal, into Islam. He made Pandua a great centre of Islamic learning and spiritual power, while Gour was the centre of political power.”^{৪৪}

চরিত্র বৈশিষ্ট্য

নূর কুতুবুল আলম তাঁর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যক্তিগত লোভ-লালসা প্রতিহিংসাপরায়ণতা, উচ্চাভিলাষ ইত্যাদি মানবিক দুর্বলতা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইসলামে সন্ন্যাস ব্রতের যেমন স্থান নেই, তেমনি ক্ষমতা ও অর্থের বৈভবে বিলাসবহুল জীবন যাপনের সুযোগও নেই। নূর কুতুব বিয়ে করে সংসার করেছেন, আবার কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অতিশয় সহজ ও সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। যে গণেশের হাতে তাঁর পুত্র (আনোয়ার) শহীদ হলেন, সেই গণেশের পুত্রকেই তিনি সসম্মানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন—এটি যে কত বড় মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচায়ক, তা সহজেই অনুমেয়। রাজ্য পরিচালনা করার মত দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। গণেশের মৃত্যুর পর তিনি ইচ্ছা করলেই নিজে বা তাঁর কাউকে সিংহাসনে অধিকারী করতে পারতেন। কারণ তাঁর অগণিত মুরীদ ছাড়াও তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ তাঁর অনুকূলে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকলে ইসলামী দাওয়াতের কাজ ব্যাহত হবে, এ আশংকায় তিনি তা করেননি। আল্লাহর খাঁটি ওলী হিসেবে তিনি কারামত বা অলৌকিক শক্তির অধিকারীও ছিলেন।^{৪৫} কিন্তু কদাচ তিনি তা ব্যবহার করতেন। রাস্তা দিয়ে চলার সময় বহু লোক তাঁর সম্মানার্থে তাঁর অনুসরণ করতেন। আবার অনেকে তাঁর পদচুম্বন করতেন। এতে তিনি অহংকারবোধ করতেন না বরং সম্ভবত বিব্রতবোধ করতেন। এক ফকির তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে, কিন্তু তিনি তার প্রতি সদাচরণ করেন এবং ফকিরকে টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করেন।^{৪৬}

দা'ঈ হিসেবে বৈশিষ্ট্য

ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শায়খ নূর কুত্বুল আলমের জীবনে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :

ক. একজন দা'ঈকে সর্বপ্রথম বিদ্যান হতে হয়। ইসলামী শরীয়তের মৌল বিষয় সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি দলীয় প্রমাণ সংগ্রহ করার মত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। সাথে সাথে পার্থিব বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাও তাঁকে অর্জন করতে হবে। একজন মূর্খ ব্যক্তি আবিদ হতে পারে কিন্তু দা'ঈ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

খ. অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞান হচ্ছে প্রাণহীন দেহের ন্যায়। আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই সেই দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়। আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রয়োজন বিনয় এবং আন্তরিকতার বিকাশ আর তা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত পন্থা ও পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

গ. দা'ঈকে তাঁর সমাজ এবং সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা ও মানসিকতা থাকতে হবে। প্রয়োজনের সময় যেকোন সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে দা'ঈকে খান্কাহ ছেড়ে জনতার কাতারে शामिल হতে হবে এবং যেকোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘ. দা'ঈকে একনিষ্ঠভাবে সত্যের সাধক হতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার উর্ধ্বে উঠে একমাত্র সত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর যাবতীয় কাজ পরিচালিত হবে। গণেশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ইবরাহীম শরকীকে জৌনপুর থেকে সসৈন্যে বাংলায় নিয়ে আসলেন, কিন্তু গণেশ যখন আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা ভিক্ষা করলো এবং পুত্রকে মুসলমান বানিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলো, তখন শায়খ কুত্ব ক্ষমার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিলেন এবং ইবরাহীম শরকীকে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু আদর্শের কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে জয় করা তার চেয়েও বড় কিছু। নূর কুত্বুল আলম একজন আদর্শ দা'ঈ হিসেবে এ দু'টি কাজই অত্যন্ত সফলভাবে করতে পেরেছিলেন।

রচনাবলী

শায়খ নূর কুত্বুল আলম তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনে অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে একাধিক মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে, ক. মু'গিসুল ফুকারা এবং খ. আনীসুল গুরাবা। বাংলায় সুফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত স্থানীয়

তথ্যের উৎস হিসেবে পুস্তক দু'টি সমাদৃত। প্রথমোক্ত পুস্তক মূলত তাঁর মুরীদদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত। 'মালিক' বা 'যাকির' (আধ্যাত্মিক ছাত্র)-এর প্রাথমিক শিক্ষা তথা ভোর থেকে নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত সময়ে ফরয নামায ব্যতীত নফল অতিরিক্ত নামাযসমূহ কখন কিভাবে আদায় করতে হবে বিভিন্ন প্রকার যিকির ওযীফা চিশতিয়া তরীকা থেকে (পদ্ধতি) অনুযায়ী কখন কিভাবে আমল করতে হবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ 'মুগি'সুল ফুকারা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহর ভালবাসা, অনুশোচনা (তওবা), দারিদ্র, আত্মতুষ্টি, যিকির, পার্থিব জগতের প্রত্যাখ্যান, শরীয়তের তাৎপর্য ইত্যাদির ন্যায় সূফীবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর অবতারণা ও ব্যাখ্যার আলোচনা করা হয়েছে এ পুস্তকে।^{৪৭} পুস্তকে সর্বমোট ঊনত্রিশটি অধ্যায় (ফাসল) আছে, তন্মধ্যে প্রথম চৌদ্দটি অধ্যায় ইবাদত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং বাকী অধ্যায়গুলো সূফীবাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পুস্তকের একটি পাণ্ডুলিপি ভাগলপুরস্থ (বিহার) খলিফাবাগে 'কুতুবখানা-ই-শাহ দামারিয়াবাবা' নামক প্রাইভেট লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ পুস্তকের অপর একটি অসম্পূর্ণ কপি (ছয় অধ্যায় সংকলিত) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল (কলকাতা) লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে বলে জানা যায় (সংগ্রহ নং ৪৬৬)^{৪৮}

'আনীসুল গুরাবা' গ্রন্থটিতে সূফীবাদের মৌলিক বিষয়াদি ছাড়াও প্রশিক্ষণ ধারার বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থের দু'খানি পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল লাইব্রেরীতে (কলকাতা) সংরক্ষিত আছে (সংগ্রহ নং ১২১২ ও ১২১৩)।^{৪৯}

তা ছাড়া শায়খ নূর কুতুবুল-আলম কর্তৃক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের কাছে লিখিত পত্রাবলীর সংগ্রহ 'মাকতুবা-ই-নূর-কুতুবুল আলম' নামে সংগৃহীত হয়েছে। এতে মোট তেরখানা পত্র স্থান পেয়েছে। পত্রগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন অবস্থা ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ সংকলনের একটি কপি ইন্ডিয়ান আরকাইভ (নয়া দিল্লী)-এ সংরক্ষিত আছে। এর অপর একটি কপি পাটনার জনাব সাইয়িদ তাকী হাসান বলখী-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে বলে জানা গেছে।^{৫০}

উপসংহার

শায়খ নূর কুতুবুল আলম ধর্মীয় ও লোকাবাসী শিক্ষায় পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, শিক্ষা বিস্তার, জনকল্যাণ ও রাজনীতির সমন্বয়ে এক বৈচিত্র্যময় অথচ সুসমন্বিত জীবন যাপনের উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন যা কেবল চিশতিয়া

তরীকার সালিক বা পীর মুর্শিদগণের জন্যই নয় বরং ইসলামী দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে নিয়োজিত প্রত্যেক দা'ঈর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পরিতাপের বিষয় বংগে সূফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর আকর হিসেবে বিবেচিত তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্রাবলী এখনো পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি আকারেই বিদ্যমান। আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আমাদের জানামতে বাংলাদেশের কোন গ্রন্থাগারে উপযুক্ত গ্রন্থ ও পত্রাবলীর কোন রটোগ্রাফ বা ফটোস্ট্যাট কপির পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ নেই। অথচ বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে নূর কুত্বুল আলমের ভক্তদের সংখ্যা মোটেও কম নয়। সুতরাং এ প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রস্তাব :

ক. অবিলম্বে নূর কুত্বুল আলমের গ্রন্থদ্বয় ও পত্রাবলীর ফটোস্ট্যাট কপি সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারী সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে।

খ. বর্তমানে বাংলাদেশে 'বেশ কিছু সংখ্যক' নামী দামী পীর মাশায়েখের 'দরবার' (খানকাহও বলা যেতে পারে) রয়েছে। তাঁরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজেও আগ্রহী। এঁদের মধ্যে অনেক দরবার এমন রয়েছে যাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট শক্তিশালী। কিছুটা আয়াসলব্ধ হলেও তাঁরা ইচ্ছা করলে কুত্বুল আলমের রচনাবলীর সহজ সরল বংগানুবাদ প্রকাশ করে ভক্তদের মধ্যে সুলভ মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

গ. বংগে সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রভাব নিয়ে সামগ্রিকভাবে ইতোমধ্যে বেশ ক'টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে সত্য। নূর কুত্বুল আলমের জীবন ও কর্মের উপর পৃথকভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলার গৌরব, মহান ওলী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ সম্পর্কে গবেষণা করলে অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কেই শুধু নয়, বাংলার তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক অজানা তথ্য বের হয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তা ছাড়া বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সূফী দরবেশ, পীর মাশায়েখগণ কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তাও পরিষ্কারভাবে জানা যাবে।

হযরত শায়খ নূর কুত্বুল আলম (র) ৮১৮/১৪১৫ মতান্তরে ৮৫১/১৪৪৭ সালে পাণ্ডুয়ায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানকার ছোট দরগায় পিতার কবরের সাথে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৫২৩।
২. বর্তমানে এটি একটি বিরান শহর। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার চাপাই-নবাবগঞ্জ শহরের উত্তর পশ্চিমে এবং ভারতের মালদহ জেলা শহর থেকে দু'মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বাংলার অপর রাজধানী শহর গৌড় থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় বিশ মাইল দূরত্বে এর অবস্থান। পাণ্ডুয়ার অপর নাম পারোয়া এবং হযরত পাণ্ডুয়া। হুগলী জেলায় এ নামে অপর একটি ঐতিহাসিক স্থান আছে। তাই পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এটিকে হযরত পাণ্ডুয়া বলা হয়। ফিরোজাবাদ নামেও এর পরিচিতি আছে। এখানে ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ, একলাখী গম্বুজ, আদিনা মসজিদ, কদম রসূল, ছোট দরগাহ, বড় দরগাহ ইত্যাদির ন্যায় প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্যের বিখ্যাত নিদর্শন বিদ্যমান। নূর কুতুবুল আলম ৮১৮/১৪১৫ বা ৮৫১/১৪৪৭ সালে পাণ্ডুয়ায়ই ইন্তেকাল করেন এবং এখানকার ছোট দরগায় তাঁর পিতার সমাধিপাশে সমাধিস্থ হন।
৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত পৃ. ৫২৩; মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, অধ্যাপক, গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুবুল আলম (র), (ঢাকা, ১৯৯১) পৃ. ৩২।
৪. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।
৫. Khan Shaheb Abid Ali Khan, Memoirs of Gour and Pandua, বংগানুবাদ ও সম্পাঃ চৌধুরী শামসুর রহমান, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি (ঢাকা, ১৯৮৫) পৃ. ১০৮।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮, ১০৯।
৭. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।
৮. আবদুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (ঢাকা-১৯৯৩) পৃ. ১৪৮।
৯. রহমান আলী, তায়কিরাহ-ই-উলামা-ই-হিন্দ (লক্ষ্ণৌ, ১৯৯৪) পৃ. ১৪৩, আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, ৩২।
১০. শায়খ আখি সিরাজ উদ্দীনকে তাঁর মুর্শিদ নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া আদর করে 'আইনা-ই-হিন্দুস্থান (হিন্দুস্থান দর্শন) বলে ডাকতেন। নিয়ামুদ্দীনের মৃত্যুর পর আখি সিরাজ বাংলায় আসেন।
১১. শায়খ আবদুল হক দেহলভী, আখবারুল আখইয়ার ফী আস্রারুল আবরার, (দিল্লী, ১৩৩২ হি.) উর্দু অনুবাদ (করাচী ১৯৬৩) পৃ. ১৪৩; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৮; আবিদ আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।
১২. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩, ৩৪; অধ্যাপক সগীর এ তথ্যটির বরাতে ড. সৈয়দ আতহার আব্বাস রিয়ভী কর্তৃক History of Sufism in Bengal গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তথ্যটি নির্ভুল বলে মনে হয় না। কেননা, অন্যান্য সূত্রমতে আলাউল হকের ঐ ঘটনা জালাল উদ্দীন তাবরীযী নয় বরং আখি সিরাজের সাথেই সম্পৃক্ত। মখদুম শায়খ জালাল তাঁর অন্যতম পীর শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর জন্য গরম খাবার পরিবেশনের সুবিধার্থে সফরের সময় একটি চুল্লী বহন করতেন। কারণ শিহাব উদ্দীন অসুস্থতার কারণে ঠাণ্ডা

খাবার খেতে পারতেন না। (দ্র. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬) তা ছাড়া জালাল উদ্দীন তাবরীযী ১২২৬ মতান্তরে ১২৪৪ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন এবং আলাউল হক মৃত্যুবরণ করেন ১৩৮৪ বা ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে। উভয়ের মৃত্যু সালের মধ্যে ন্যূনাধিক দেড়শ বছরের ব্যবধান। সুতরাং সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাবরীযীর জীবদ্দশায় আলাউল হক আদৌ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি? অথবা জন্মগ্রহণ করে থাকলেও মুর্শিদের জন্য মাথায় চুল্লী বহন করার মত বয়স হয়েছিল কি? এদিক থেকেও মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা ও রিয়তী প্রদত্ত তথ্য দুর্বল বলে মনে হয়।

১৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বংগে সুফী প্রভাব, (কলকাতা, ১৯৩৫) পৃ. ১০৮।
- ১৩খ. বলা হয়ে থাকে যে, সুলতানের মনে একরূপ সন্দেহের উদ্বেক হয়েছিল যে, সরকারী খাজাঞ্চীখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত (অর্থসচিব) আলাউল হকের পিতাই সম্ভবত গোপনে পুত্রের জন্য বিপুল অর্থের যোগান দিতেন। তু, শেখ আবদুল লতীফ, The Muslim Mystic Movement in Bengal (Calcutta : K. P. Bagchi & Company, 1993) p. 27
১৪. শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮; মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত ৩৪।
১৫. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯। এটি নিঃসন্দেহে আলাউলের একটি কারামত। তাঁর আরো কিছু কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন আবদুল করিম তাঁর 'বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে। (দেখুন পৃ. ১৪৮)
১৬. আখ্বারুল আখ্ইয়ার, পৃ. ১৪৯।
১৭. আবদুল করিম, ১৪৯; মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, ৩৫; এনামুল হক ১০৯। কিন্তু দরগার খাদিমের কাছে রক্ষিত একটি পুস্তক অনুসারে তিনি ১৩৮৪ খৃ. (৭৮৬ হি.) ইন্তেকাল করেন। দ্র. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।
১৮. মুহাম্মদ খুশী সান্তারী গুলয়ার-ই-আব্রার, (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৬১, ৬২ উদ্ধৃত শেখ আবদুল লতীফ, পৃ. ২৬।
১৯. আখ্বারুল আখ্ইয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।
২০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৫২৩, মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫, শেখ আবদুল লতীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।
২১. শেখ আবদুল লতীফ, পূর্বোক্ত।
২২. পূর্বোক্ত।
২৩. শেখ আবদুল লতীফ কুত্বুল আলমের এহেন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

"Perhaps these duties of menial type were assigned to him because the Shaikh (Alaul Haq) waited to inculcate in him the spirit of self attachment, self-abnegation and humility. A son of a distinguished saint was prone to develop a superiority complex, but Shaikh Alaul saw to it that his son did not behave as a saint, but as a servant of saints." The Muslim Mystic Movement in Bengal, op it, P. 29.

২৪. আযম খানের উত্তরে কুতুব-উল-আলম যা বলেছিলেন, এনামুল হকের ভাষায় তা এরূপ : “On hearing this Nuruddin replied, I have no necessity of your wealth and gradeur which are perishable. To carry faggots for the monastery is better (than wealth), the post of dignitaries is for you”, A History of Sufism in Bengal, P. 173.
২৫. তু. শেখ আবদুল লতীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১; মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পৃ. ৩৬।
২৬. হাদীসের মর্মার্থ এরূপ : ন্যায়পরায়ণ শাসক হচ্ছেন আল্লাহর ছায়া, যে ব্যক্তি আল্লাহর এই ন্যায়পরায়ণ শাসককে অবমাননা করবে, সে যেন আল্লাহকেই অবমাননা করে।
২৭. শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহকে শরীফ উদ্দীন আবু তাওয়ামাহ এবং মওলানা আশরাফ উদ্দীন তাওয়ামাহ নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি বুখারার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, ধার্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেই শুধু নয়, আরব, ইরান এবং অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত। এমন কি রসায়ন ও প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং যাদুবিদ্যা সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল। (দ্র. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭) সর্বোপরি তিনি হাদীসবিশারদ হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। “He was well versed in the traditions of the Prophet and other branches of Islamic learning : (cf. Sk. Abdul Latif, op. cit, P. 14.)।
- আবু তাওয়ামাহর বাংলায় আগমন সম্পর্কিত সময়কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আবদুল করিম বিভিন্ন সূত্রের আলোচনা পর্যালোচনা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আবু তাওয়ামাহ ১২৮২ থেকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সোনারগাঁয় এসেছিলেন : এরূপ অনুমানই যুক্তিসংগত (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯)। সুতরাং তৎকর্তৃক স্থাপিত সোনারগাঁয়ের মাদ্রাসার স্থাপনকাল উপযুক্ত সাল দুটির পরবর্তী কোন এক সময়ে।
২৮. তু. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
২৯. পূর্বোক্ত।
৩০. স্বয়ং সুলতান একবার তীর ছুঁড়তে গিয়ে জনৈকা বিধবার পুত্রকে আহত করেন। বিধবা কাযীর নিকট বিচার প্রার্থনা করলে কাযী স্বাধীনভাবে সুলতানকে আদালতে হাযির হওয়ার সমন জারি করেন এবং বিচারে বিধবাকে সন্তুষ্ট করেন। রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থে বর্ণিত এ চমৎকার কাহিনী সর্বজন বিদিত।
৩১. রেনেলের মানচিত্র (১৭৮৮) অনুসারে ভাতুড়িয়া উত্তরবঙ্গের একটি অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর পশ্চিম দিকে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী এবং উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায়, উত্তর বঙ্গের ভাতুড়িয়া (বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত) অঞ্চলে রাজা গণেশের জমিদারী ছিল। তু. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা. পৃ. ৪৫, ৪৬।
৩২. সুফী দরবেশগণ মুসলিম রাজ্যের অমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে (নীতি নির্ধারণী পদে) নিযুক্তির বিরোধ ছিলেন। গিয়াস উদ্দীন আযম শাহকে এ ব্যাপারে বলা হয়েছিল কিন্তু পূর্বপুরুষদের আমল থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত হেতু রাজা গণেশের ব্যাপারে তিনি কঠোর হতে পারেন নি।

৩৩. তু. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পৃ. ৪৬।
৩৪. এ চার বছরের মধ্যে গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের গৃহবিবাদ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরপর তিনজনকে সিংহাসনে বসান এবং এক এক করে তাদেরকে হত্যা করান। এ তিন জন হচ্ছেন ১. সাইফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪০৯-১৪১১), শিহাব উদ্দীন বায়জিদ শাহ (১৪১১-১৪১৩) এবং আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪১৪ খৃ.)।
৩৫. গণেশের হাতে নিহত আলিমগণের মধ্যে শেখ আনোয়ার এবং শেখ বদরুল ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার দ্বারা ধন-সম্পদ লুটের কথাও জানা যায়।
৩৬. 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'-এর বরাতে নূর কুতবের ঐ পত্রের বংগানুবাদের জন্য দেখুন মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পূর্বোক্ত পৃ. ৫০, ৫১; এর সূত্র থেকে আরো জানা যায় যে, ইবরাহীম শরকী নূর কুতবের পত্র পেয়ে জ্ঞানতাপস সাইয়িদ আশরাফ জাহাংগীর সিমনানীর কাছে তাঁর উপদেশ চেয়ে পত্র লিখেন। উত্তরে সিমনানী যে পত্র শরকীকে প্রদান করেন, সে সুদীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষের বংগানুবাদ দেখুন (পূর্বোক্ত পৃ. ৫১-৫৪)।
৩৭. শেখ আবদুল লতীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।
৩৮. বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পৃ. ৫৮-৬০।
৩৯. তু. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, পৃ. ৬৩।
৪০. রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীনকে পুনরায় স্ব ধর্মে ফিরিয়ে আনার উপায় হিসেবে কিছু পরামর্শদাতার পরামর্শমতে এ উপায় অবলম্বন করেন। একে সুবর্ণধেনু ব্রত আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু তওহীদের মর্মবাণী জালালের হৃদয়কে করেছিল উদ্ভাসিত। তিনি ব্রত পালন করলেও প্রকৃতপক্ষে এ শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হননি। গণেশ অগত্যা তাকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন।
৪১. গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রদেব পিতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু দু'এক মাসের বেশী রাজত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।
৪২. জালালুদ্দীনের রাজত্বকাল ১৪১৮-১৪৩১ এবং শামস উদ্দীনের রাজত্বকাল ১৪৩২-১৪৪২ খৃ.।
৪৩. বংগে সুফী প্রভাব, পৃ. ১১০।
৪৪. Ayyub Ali, A. K. M., History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, (Dhaka, 1983), P. 17.
৪৫. আল্লাহর ওলীগণ অলৌকিক গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন, যা সাধারণ মানুষের থাকে না। বলা হয়েছে, 'কারামাতুল আউলিয়ায়ি হাক্কুন' অর্থাৎ ওলীগণের কারামত সত্য।
৪৬. আখবারুল আখ্ইয়ার, পৃ. ১৫৮-৫৯।
৪৭. শেখ আবদুল লতীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫ (পাদটীকা-১ দ্রষ্টব্য)।
৪৯. পূর্বোক্ত, (পাদটীকা-২ দ্রষ্টব্য)।
৫০. পূর্বোক্ত, (পাদটীকা-৩ দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গকথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও স্মরণিকায় যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা পত্রিকার পাতায় রয়ে গেছে। অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় পত্রিকাগুলো সহজলভ্য নয়। অথচ এসব বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পাঠক জানতে আগ্রহী।

তাছাড়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুলভ মূল্যে ভাল বই পাঠকের হাতে পৌঁছানো। এ উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সীমিত পৃষ্ঠার বেশ কিছু পুস্তক প্রকাশ করেছে। এসব পুস্তক ব্যাপকভাবে পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'য় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত যুগ-জিজ্ঞাসা ও মনীষীদের জীবনীমূলক প্রবন্ধ থেকে বাছাইকৃত কিছু প্রবন্ধ পাঠকদের হাতে তুলে ধরার লক্ষ্যে সুলভ সংস্করণ প্রকাশের এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আমরা ষোলটি পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। পর্যায়ক্রমে এ ধরনের আরও পুস্তক প্রকাশ করা হবে।

এই পরিকল্পনার আওতায় বিশিষ্ট লেখক ড. এ. কে. এম. নুরুল আলম ও ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন প্রণীত নূর কুতবুল আলম (র) শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি আমাদের এ উদ্যোগ পাঠকদের নিকট সাদরে গৃহীত হবে।

— প্রকাশক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ